নদীর কোনও ধর্ম হয় না। গঙ্গার পাড় ঘেঁষেই মসজিদের পিছনে একটা মাঠ। সেখানেই বল পেটাত গোপী–সিরাজ–মন্টু–বুলবুল–মজিদরা। খেলার পর সিরাজ বালতি ভরে গঙ্গার জল দিয়ে আসত গোপীর বিধবা মাকে। পুরস্কার জুটত দু'টো গুজিয়া। গঙ্গা মানে তো চিরন্তন ভালোবাসার ছলাৎছল। কোনও বিরোধ, কোনও মালিন্য তার স্বভাব নয়। কিন্তু কলুষনাশিনী পুণ্যতোয়া গঙ্গাকে উন্নয়নের ডঙ্কা বাজানো নেতারা কবেই যেন কলুষবাহিনীতে পরিণত করেছেন। কলকাতা, বারাণসী, এলাহাবাদ সর্বত্রই এক ছবি। হাজার বছর ধরে বয়ে আসা গঙ্গা যে আমাদের সব ভারতীয়রই হৃদস্পন্দন– এ বোধ কবে হবে? বিশেষজ্ঞ নয়, নেহাৎই এক আম–আদমির গঙ্গাপ্রেমের বৃত্তান্ত অতঃপর

সে দিনটা ছিল গঙ্গা দশেরা। গঙ্গার জন্মদিন। মায়ের মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়েছিল বাচ্চা ছেলেটি। তারপর বাগবাজার গঙ্গার ঘাটে দাঁড়িয়ে মা'কে সে প্রশ্ন করেছিল,মানুষের জন্মদিনের মতো নদীরও কি জন্মদিন থাকে? মা উত্তর দিয়েছিল, সবই তো বিশ্বাস। যদি তুমি বিশ্বাস করো গঙ্গা আমাদের মা। যুগযুগান্তর ধরে সব মায়ের মতো গঙ্গাও ভারতবর্ষের মানুষকে লালন পালন করে চলেছে। তা হলে আর সব মায়ের মতো তারও কেন জন্মদিন থাকবে না!

অবাক চোখে ছেলেটি দেখেছিল গঙ্গাতে নেমে কেউ কোমর জলে স্নান করছে। কেউ সাঁতার কাটছে। কেউ স্নান সেরে গঙ্গার তীরে দাঁড়িয়ে সূর্যের দিকে তাকিয়ে মন্ত্র পড়ছে। ছেলেটি মা'কে প্রশ্ন করেছিল, এত মানুষ কেন গঙ্গাস্নান করে? ছেলেকে মা জবাব দিয়েছিলেন, গঙ্গাস্নান করলে সমস্ত পাপ ধুয়ে যায়। যখন কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে পা দিয়েছিল ছেলেটি, তার মনের মধ্যে জেগে উঠেছিল প্রশ্ন। কীসের এই বিশ্বাস? কেন এই বিশ্বাস। কিন্তু উত্তর খোঁজা হয়ে ওঠেনি তার।

একদিন তার খুব প্রিয় মানুষ চলে গেলেন। জীবনের সীমানা পেরিয়ে মৃত্যুর দেশে। গঙ্গার কূলে তাঁর শেষ কাজ করা হল। চিতাভস্ম ভাসিয়ে দেওয়া হল গঙ্গার জলে। তীরে বসে এক বৃদ্ধ বললেন আত্মার মুক্তি হয়ে গেল। জন্ম জন্মান্তরের সমস্ত পাপ থেকে মুক্তি। কেন এই বিশ্বাস? যুবকের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল এই প্রশ্ন।

তারপর গঙ্গার ঘাটে এক সাধুর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল তার। তাঁকে ওই একই প্রশ্ন করতে তিনি বলেছিলেন তাঁরও ওই প্রশ্নের উত্তর জানা নেই। জানা আছে যা, তা শুধু বিশ্বাস। তা হলে উত্তর পাওয়ার উপায় কী? সেই সাধু ওই যুবককে বলেছিলেন, গঙ্গার তীরে তীরে আছে তার উত্তর। সেখানে গেলে দেখা যাবে ভারতবর্ষকে। আর পাঁচ হাজার বছরের সভ্যতা সংস্কৃতি ধর্ম আর জীবনচর্চাকে। তখনই অনুভব করা যাবে, এ দেখার কী আনন্দ। জীবনের সঙ্গে গঙ্গা একাত্ম হয়ে গেল এই ভাবেই। তারপর?

মাঝবয়সী একহারা চেহারা। গালের উপর বলিরেখাটা বেশ স্পষ্ট হয়েছে। কপালটা অনেকটা চওড়া। হাত মুখের রং রোদে পুড়ে তামাটে বর্ণ হয়ে জামার ভিতর থেকে শরীরের আসল রংটা উঁকি দিচ্ছে মাঝে মাঝে। পুরো শরীর দিয়ে ঘাম চুঁইয়ে পড়ছে। তবু কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই শরীর নিয়ে। পুরো শরীরটাই যেন তাঁর কাছে গঙ্গা নদী। ভালোই বোঝা যাচ্ছে তাঁর শরীরটা জুড়ে রয়েছে অক্লান্ত পরিশ্রমের ছাপ। নাম চঞ্চল কুমার ঘোষ।

কীভাবে চঞ্চলের আগ্রহ জন্মাল গঙ্গার প্রতি?

প্রশ্নটা পাওয়া মাত্রই উজ্জ্বল আলোতে ভরে উঠল চঞ্চলের মুখ। যেন কোনও মিষ্টি স্মৃতি তাঁকে ছুঁয়ে গেল। চঞ্চল বলে উঠলেন তাঁর ছেলেবেলার কথা। যখন তিনি ঠাকুমার হাত ধরে গঙ্গার তীরে এসে বসতেন। এই ভাবে কখন যে তাঁর গঙ্গার প্রতি ভালোবাসা জন্মে গিয়েছিল,তা তিনি নিজেই জানেন না। এর পর একদিন হঠাৎ করে বেরিয়ে পড়া। বিশ্বাস ছাড়া সহায় সম্বল আর কিছুই ছিল না। যিনি পথের দেবতা তিনিই পাথেয় জোগাড় করে দিলেন। সেই পথই তিনি নিলেন, যে পথে গিয়েছিলেন মহারাজ ভগীরথ। কারণ তিনি জানেন, সেই পথেই রয়েছে মানব সভ্যতার শ্রেষ্ঠ রূপ। গঙ্গার উৎসমুখ থেকে গঙ্গোত্রী, উত্তরকাশী, দেবপ্রয়াগ, হৃষীকেশ, হরিদ্বার, বিঠুর, কানপুর, এলাহাবাদ, বারাণসী, পাটনা, মুর্শিদাবাদ, নবদ্বীপ, কলকাতা হয়ে গঙ্গাসাগরে। চলতে চলতে মনে হয়েছিল, এ কোনও নদীকে দর্শন নয়। ভারতাত্মার প্রবাহমান ধারাকে দর্শন করা।

শুরুটা সেই গঙ্গা থেকেই। ভারতবর্ষের প্রাণ প্রবাহিনী ধারা গঙ্গা। ভারতবাসীর কাছে গঙ্গা তার অধ্যাত্ম ভাবনা, তার সংস্কৃতি, তার জীবন চর্চার এক মূর্ত রূপ। যুগান্তরের বিশ্বাস, গঙ্গা কোনও জাগতিক প্রবাহ নয়। এ যেন ঈশ্বরের সৃষ্ট এক অমৃত ধারা। চির পবিত্রতার প্রতীক। যাঁর স্পর্শ মাত্রই জীবনের সব পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। মহত্ব অনেক নদীরই আছে। কিন্তু গঙ্গার মতো মাহাত্ম্য তাদের নেই। নীলনদ গঙ্গার আড়াই গুণ দীর্ঘ, আমাজন ,মিসিসিপি দ্বিগুণ দীর্ঘ। এমনকি দানিয়ুব, সিন্ধুও গঙ্গার চেয়ে দীর্ঘতর। কিন্তু দৈর্ঘের জন্য নয়, গঙ্গার মাহাত্ম্য অন্য কারণে। তার পবিত্রতার ধারণায়। প্রাচীন কাল থেকে দর্শনে, স্নানে,পানে গঙ্গা পতিতপাবনী। তাই ভারতবর্ষ জুড়ে গঙ্গা নিয়ে এত গঙ্গাস্তুতি ও এত কাহিনি।

গঙ্গার কথা পাওয়া যায় প্রথম ঋকবেদ সংহিতায়। তবে মাত্র তিনটি মন্ত্রে। তৃতীয় মণ্ডলের ৫৮ সূক্তে গঙ্গাকে জাহ্নবী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়া ষষ্ঠ মণ্ডলের ৪৫ সূক্তে গঙ্গা সম্বন্ধীয় উন্নত কূল অর্থে 'উরুঃ কক্ষো ন গাঙ্গ্যঃ' বলা হয়েছে। এ ছাড়া দশম মণ্ডলের ৭৫ সূক্তে বলা হয়েছে হে গঙ্গা! হে যমুনা ও সরস্বতী! শতদ্রু ও পুরুষ্ণি! আমার এই স্তবগুলি তোমরা ভাগ করে নাও। সমস্ত ঋকবেদ জুড়েই সিন্ধু আর সরস্বতীর মহতি বর্ণনা। গঙ্গার বিস্তৃত কথা প্রথম পাওয়া যায় মহাকবি বাল্মীকির রামায়ণে।

ভাগীরথীর উৎস গঙ্গোত্রী হিমবাহ। গাড়োয়াল ও কুমায়ুন হিমালয়ের মধ্যে গঙ্গোত্রী হিমবাহকে বলা হয় বৃহত্তম। লম্বায় ২৪ কিলোমিটার। দৈর্ঘে ৭–৮কিলোমিটার। এই হিমবাহকে ঘিরেই রয়েছে ছোট–বড় নানান পর্বতশৃঙ্গ। যেমন–কীর্তিস্তম্ভ, শিবলিং, মেরু পর্বত, ভৃগুপন্থ, শতপন্থ প্রভৃতি। এই সব পর্বত থেকে ছোট বড় হিমবাহ এসে গঙ্গোত্রী হিমবাহকে সমৃদ্ধ করেছে। এই হিমবাহের গুহা থেকেই জন্ম নিয়েছে পবিত্র জলধারা। ৩৮৯২ মিটার উঁচুতে দুর্গম পরিবেশের মধ্যে এই অপরূপ গুহার সৌন্দর্য দেখে কোনও তীর্থযাত্রী এর নাম রাখেন গোমুখ। এর অভিধানগত অর্থ গরুর মুখ। অন্য অর্থে পৃথিবীর মুখ।

এই গঙ্গার টানেই একদিন ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়া চঞ্চলের। বেলা গড়িয়ে বাস থামল গঙ্গোত্রীতে। মুহূর্তে বাসযাত্রীদের কলধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠল চারিদিক। চঞ্চলের ঠোঁটও তখন কেঁপে উঠেছে। তিনিও বলে উঠলেন গঙ্গা মাঈকি জয়! কিছুটা এগিয়েই ঢালু রাস্তা নীচের দিকে নেমে গিয়েছে। সামনে গঙ্গা বোল্ডারের উপর প্রবল বেগে আছড়ে পড়ছে। ওপারে যাওয়ার জন্য রয়েছে ঝুলা অর্থাৎ ঝুলন্ত সেতু। এখানে গঙ্গা উত্তরবাহিনী। অর্থাৎ গঙ্গা উত্তরী বলে নাম হয়েছে গঙ্গোত্রী। এখানেই গঙ্গার প্রথম মন্দির। বহু প্রাচীন মন্দির। চারিদিকে পর্বত ও দেবদারু গাছের বন।১৮২০ সালে শিল্পী জেমস বেলি ফ্রেজারের আঁকা ছবিতে প্রথম গঙ্গোত্রীর প্রাচীন মন্দিরের ছবি পাওয়া যায়। ফ্রেজার প্রথম ইউরোপীয় যিনি গঙ্গোত্রীতে যান। শোনা যায় সম্রাট আকবরও লোক পাঠিয়েছিলেন গঙ্গার উৎস দেখে আসতে।

গঙ্গোত্রী থেকে গঙ্গা দক্ষিণ বাহিনী হয়ে এসেছে মুখবায়। বহু প্রাচীন এই গ্রাম। পথের পাশের গ্রাম ধারালি। এখান থেকে গঙ্গোত্রী ২৫ কিলোমিটার। সকালের ঘুম ভেঙে হোটেলের বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই চঞ্চলের চোখে পড়ল গোটা মুখবা বরফে ঢাকা। দূরে বরফে ঢেকে গিয়েছে বান্দরপুঞ্ছ পর্বত। পাথরভর্তি নদীখাত। তার মাঝখান দিয়ে বয়ে যাচ্ছে গঙ্গা। এখানে ততটা উচ্ছ্বাস নেই। ধীর শান্ত ভাবে বয়ে যাচ্ছে সে। সামনেই গঙ্গা দেবীর আর এক মন্দির। মুখবা গ্রামের অধিবাসীদের বলা হয় সিমোয়াল। তারাই যুগ যুগ ধরে গঙ্গোত্রী মন্দিরের পূজারী।

গঙ্গোত্রী থেকে গঙ্গা ধারালি, হরশিল, ঝালা, ভাটোয়ারি, মানেরি, গাঙ্গুরি হয়ে ১০০ কিলোমিটার পথ পেরিয়ে এসেছে উত্তরকাশীতে। অতীত কালে এখানে নাকি তিনশোর বেশি মন্দির ছিল বলে দাবি। এখন মন্দিরের সংখ্যা অনেক কম। এখানেই রয়েছে প্রাচীন বিশ্বনাথ মন্দির, শক্তি মন্দির, কালী মন্দির, কুটেশ্বর মন্দির। এ ছাড়াও অনেক আশ্রম। বাস স্ট্যান্ডে চঞ্চলের সঙ্গে আলাপ হয় একজন সাংবাদিকের। বহু দিন ধরে উত্তর কাশীতে তিনি সাংবাদিকতা করছেন। চঞ্চল ওই সাংবাদিকের কাছ থেকে জেনে নেন ওই অঞ্চলের অনেক খুঁটিনাটি। উত্তরকাশীতে শিব নির্জন প্রকৃতির মধ্যে ধ্যানমগ্ন যোগী। বিশ্বনাথ মন্দিরের কাছেই রয়েছে ৩০ ফুট উঁচু অষ্ট ধাতুর ত্রিশূল। প্রচলিত কাহিনি অনুসারে কিরাতরূপী মহাদেব এই ত্রিশূল দিয়ে অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। গঙ্গা যে সমস্ত ভোগের ঊর্ধ্বে তা চঞ্চল বুঝেছিলেন এক ত্যাগী মানুষকে দেখে। যিনি আগে ছিলেন একজন শিল্পপতি। সব ছেড়ে দিয়ে নিজেকেই আজ সমর্পণ করেছেন গঙ্গার কাছে। প্রকৃতপক্ষে অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি উত্তর কাশীর চরিত্র পরিবর্তন হতে থাকে। বাণিজ্য শহর উত্তর কাশী হয়ে ওঠে সাধু মহাত্মাদের সাধনার ক্ষেত্র।

পথে পড়ে টিহরি। গঙ্গা আর

মহত্ব অনেক নদীরই আছে। কিন্তু গঙ্গার মতো মাহাত্ম্য তাদের নেই। নীলনদ গঙ্গার আড়াই গুণ দীর্ঘ, আমাজন ,মিসিসিপি দ্বিগুণ দীর্ঘ। এমনকি দানিয়ুব, সিন্ধুও গঙ্গার চেয়ে দীর্ঘতর। কিন্তু দৈর্ঘের জন্য নয়, গঙ্গার মাহাত্ম্য অন্য কারণে। তার পবিত্রতার ধারণায়। প্রাচীন কাল থেকে দর্শনে, স্নানে,পানে গঙ্গা পতিতপাবনী। তাই ভারতবর্ষ জুড়ে গঙ্গা নিয়ে এত গঙ্গাস্তুতি ও এত কাহিনি